Bangladesh Journal of Political Economy

Research Note-1

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 31, No. 5, January 2017, pp. 469-484
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

টেকসই উন্নয়নে গণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং এর স্বরূপ সন্ধানে কতিপয় সুপারিশ

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন*

সারকথা: *আলোচ্য প্রবন্ধে টেকসই উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে গণমানুষের কল্যাণে তথা দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পরিচালিত করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইতিহাস, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র তুলে ধরে এর মূল্যায়ণ এবং একটি গণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্বরূপ কেমন হতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রণয়ন তথা জনকল্যাণে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। প্রবন্ধের শেষাংশে গণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রণয়নে কতিপয় সুপারিশ উত্থাপন করা হয়েছে।*

১. ভূমিকা ঃ

ব্যাংক আধুনিক অর্থনীতির এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। ব্যাংকিং খাতের যথাযথ উন্নয়ন ছাড়া একটি সমাজের কাঙ্খিত উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব। অর্থনীতির তিনটি মূল স্তম্ভ কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন এবং প্রসারে ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে ব্যাংকিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা অপরিহার্য। আমাদের দেশে ব্যাংকিং খাতের যথাযথ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাইলে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থায়নের পাশাপাশি এদেশের দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং খাতের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। এদেশের দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, প্রতিবন্ধি, অসহায়, দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা সময়ের দাবী। আর এ লক্ষ্যে ব্যাংকিং সেবা অধিকতর সুলভ, সহজলভ্য, দরিদ্রমুখী ও কল্যাণধর্মী করা জরুরী। প্রশ্ন হলো, ব্যাংকগুলো সাধারণ মানুষের কল্যাণে কোন কাজ করছে কি না ? করলে তার পরিধি কতটুকু ? কিংবা দেশ ও মানুষের স্বার্থে ব্যাংকগুলোর অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা কতটুকু ? সাধারণ ভাবে, পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এর পরিমাণ একেবারেই নগণ্য। লাগামহীন মুনাফা অর্জন একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হতে পারে না। দেশ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে জনকল্যাণে তাদের কার্যক্রমের এক বৃহৎ অংশ পরিচালনা করা অপরিহার্য। ব্যাংকগুলো যে কোম্পানী আইনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সে আইনে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা সংশোধন করে জনস্বার্থে একটি যথাযথ আইনি কাঠামো তৈরী করা যেতে পারে। যেন ব্যাংকগুলোর মুনাফা লাভের পাশাপাশি দেশ ও মানুষের স্বার্থে বিশেষ করে শ্রমজীবী সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা পালনের আইনি বাধ্যবাধকতা থাকে।

* প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, সিলেট

বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যুগে ব্যাংকিং খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। এতে ব্যাংকিং কার্যক্রম সহজতর হয়েছে, মুনাফা অর্জনের পরিমাণও বেড়ে গেছে বহুগুণ। এই তথ্য প্রযুক্তি গণমানুষের কল্যাণে ব্যবহার করে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে অরা কার্যকর, বাস্তবসম্মত করার সুযোগ আছে। 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে গণমানুষের কল্যাণে ব্যাংকিং খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। প্রশ্ন হলো, আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার কথা যেভাবে বলা হচ্ছে তাতে সেই সুযোগ কাজে লাগানো হচ্ছে কি না ? বাংলাদেশের মত দ্ররিদ্র ও জন বহুল দেশে ব্যাংকগুলোকে গণমানুষের কল্যাণে তথা দরিদ্র অসহায় শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে সবার আগে। মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে তবে মুনাফা লাভের কথা ভাবতে হবে।

সুতরাং, লাগামহীন মুনাফা লাভের সনাতন ও কাঠামোগত চিন্তার খোলস ছেড়ে আমাদের আরও অগ্রসর চিন্তা করতে হবে। একই সাথে জনকল্যাণ ও মুনাফা লাভের কথা ভাবতে হবে। আজকে যে টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে তা নিশ্চিত করতে চাইলে এদেশের বিপুল সংখ্যক বঞ্চিত সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এদেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে আরও বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। আর সে লক্ষ্য পূরণে সকল ব্যাংককে এগিয়ে আসতেই হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে:

"With a view to maintaining a sound, efficient and stable Financial system; Bangladesh Bank (BB) has initiated a number of policy measures, giving augmented emphasis on risk management in the banks, the periodical review of stability of individual banks as well as the whole banking system, exercise of stress testing, inclusion of underserved/unserved productive economic sectors and population segments in the financial system, etc".

সুতরাং, এদেশের দরিদ্র অসহায় মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে আর সুসংহত, যুক্তিযুক্ত, দেশ ও মানুষের কল্যাণে গণমুখী করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এতে ব্যাংকের সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। আজকে যে আইনি সংস্কার ও ব্যাংকিং খাত সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে সেখানে গণমানুষের কল্যাণের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থান দিতে হবে।

বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। রাজনীতিবিদ, আমলা, জনপ্রতিনিধি তথা শিক্ষিত অগ্রসর জনগোষ্ঠীর সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, মিথ্যাচার, দুর্বৃত্তায়ন, লুটপাট, ব্যাপক বেকারত্ব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি প্রভৃতি কারণে এদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির কাঙ্খিত উন্নয়ন হচ্ছে না। নীতি নির্ধারণী মহল থেকে দারিদ্র্যের হার কমে আসছে বলা হলেও বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সরকারি হিসেবে বর্তমান দারিদ্রের হার কমে আসছে দেখাতে সক্ষম হলেও ভূমি অধিকারের ভিত্তিতে দারিদ্র্য পরিমাপ করলে দেখা যাবে, দারিদ্র্যের হার বেড়েই চলছে। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থা এমন যে, ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলছে অথচ সরকারি হিসেবে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে আসছে বলা হচ্ছে।

ইদানিং টেকসই উন্নয়ন একই সাথে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার বিষয়টি জোরেসোরে উচ্চারিত হচ্ছে। তা অর্জন করতে প্রয়োজন ব্যাংকিং খাতে আমূল সংস্কার এবং গণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে এই খাতের ব্যাপক উন্নয়ন। ব্যাংকিং খাতের যথাযথ উন্নয়ন ব্যতিত টেকসই উন্নয়ন হতে পারেনা। এ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ১৯৮৬ সালে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়।

ব্যাংক ও আর্থিক খাত উন্নয়নে ১৯৯১ সালে গঠন করা হয় টাস্কফোর্স। এভাবে বিভিন্ন সময়ে এ খাত উন্নয়নের কথা বলা হলেও গণমুখী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে আমাদের ভাবনাকে আরও যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত করার বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। ব্যাংকিং কার্যক্রমকে দারিদ্র্য বিমোচনে আরও সুলভ, গণমুখী করতে 'জনকল্যাণের জন্যই ব্যাংকিং'- এই ধারণাকে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হবে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেশের অগণিত দরিদ্র অসহায় মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরও যৌক্তিক, গণমুখী ও সুসংহত করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক. দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাস তুলে ধরা।

খ. বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র তুলে ধরা এবং মূল্যায়ন করা।

গ. গণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থার স্বরূপ উপস্থাপন করা।

ঘ. দেশের দরিদ্র অসহায় মানুষের কল্যাণে গণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তনে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা।

৩. তথ্য ও পদ্ধতি ঃ

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ মাধ্যমিক উৎস হতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষার বিভিন্ন গ্রন্থ, বাংলাদেশ অর্থনীতির সমিতিসহ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন জার্নাল, বিভিন্ন গ্রন্থ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাপিডিয়া, ইন্টারনেট, বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও প্রবন্ধের সহায়তা নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর লেখকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কতিপয় পর্যবেক্ষণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইতিহাস ঃ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে এদেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশ পূর্ব ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ঔপনিবেশ আমলের ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা এই তিনটি পর্বে ভাগ করতে পারি।

ক. ঔপনিবেশ পূর্ব ব্যাংকিং ব্যবস্থা :

প্রাচীন কাল তথা খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ হতে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ সময়কালে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে, ব্যবসায়ীদের পরস্পরকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে তথ্য রয়েছে। সে সময়ে ঋণ ও ঋণের অংশের উপর বাড়তি পরিশোধ (সুদ) বিষয়েও জনগণের অভিজ্ঞতা ছিল। ঋণ গ্রহণ ও প্রদানের চর্চা বৈদিক আমলেও চালু ছিল। 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে ব্যাংকিং ব্যবসায় এবং সুদের উল্লেখ রয়েছে।

মুগল শাসনামলে প্রবর্তিত অর্থ ব্যবসায়ে স্থানীয় কিছু পরিবার যথেষ্ঠ প্রসিদ্ধ লাভ করে। এ সকল পরিবারের মধ্যে জগৎশেঠ পরিবারই ছিল শক্তিশালী। ঢাকা, হুগলী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্রে জগৎশেঠ পরিবারের অর্থ ব্যবসায়ের শাখা ছিল। এ সময়ে বৃহৎ পুঁজিপতি ব্যাংকার হতে শুরু করে ক্ষুদ্র গ্রাম্য মহাজন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের লোক নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী টাকা পয়সা লেনদেন ব্যবসা

করত। অর্থাৎ মুগল আমলেই ভারতীয় উপমহাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। ১৭০০ সালে ভারতের কলকাতায় দ্য হিন্দুস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় যা এ অঞ্চলের সর্ব প্রথম আধুনিক ব্যাংক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

খ. ঔপনিবেশিক আমলের ব্যাংকিং ব্যবস্থা :

বৃটিশরা তাদের নিজ দেশের অর্থনীতির বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য কলোনী দেশগুলো হতে যে লুণ্ঠনের সংস্কৃতি চালু করে তা সহজতর করার মানসেই বোধ করি এদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করে। ১৭৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ব্যাংক ছিল বৃটিশ আর্শীবাদপুষ্ট প্রথম আধুনিক ব্যাংক। ঢাকা ব্যাংক বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক যা ১৮০৬ সালে কার্যক্রম শুরু করে। ১৮৬২ সালে ঢাকা ব্যাংক কিনে নিয়ে বেঙ্গল ব্যাংক এ অঞ্চলে তার প্রথম শাখা খোলে।

অবিভক্ত ভারতে ১৮০৬ সালে ব্যাংক অব ক্যালকাটা, ১৮৪০ সালে ব্যাংক অব বোম্বে এবং ১৮৪৩ সালে ব্যাংক অব মাদ্রাজ নামে তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল ব্যাংকের সমন্বয়ে ১৯২১ সালে দি ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত এটি বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। এতদ্ব্যতীত বাংলা অঞ্চল সহ ব্রিটিশ ভারতে অন্যান্য বেশ কিছু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্মরত ছিল। ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশ এলাকায় লোন অফিস নামে পরিচিত এ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ফরিদপুর (১৮৬৫), বরিশাল (১৮৭৩), ময়মনসিংহ (১৮৭৩), ঢাকা (১৮৭৮), সিলেট (১৮৮১), খুলনা (১৮৮৭) ইত্যাদি এলাকায় তাদের কার্যক্রম ছিল। অপরদিকে এলাকাভিত্তিক কতিপয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় যা নিচের সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

ব্যাংক	প্রতিষ্ঠাকাল
কুড়িগ্রাম ব্যাংক	১৮৮৭
কুমারখালী ব্যাংক	১৮৯৬
মহালক্ষী ব্যাংক, চট্টগ্রাম	১৯১০
দিনাজপুর ব্যাংক	১৯১৪
কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশন	১৯১৪
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক	১৯২২

উৎস : বাংলাপভিয়া, (খন্ড-৭) ২০০৩।

যে সকল ভারতীয় ব্যাংকের এতদ অঞ্চলে শাখা ছিল সেগুলো হচ্ছে ঃ ন্যাশনাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (১৮৬৪), বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাংক (১৯১৮), নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক (১৯২০), ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (১৯২১), হাবিব ব্যাংক (১৯৪১) এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (১৯৪২)।

বৃটিশ আমলে ব্যাংকিং ব্যবসা দ্বারা মূলতঃ ধনী অর্থলগ্নীকারী ব্যবসায়ীদের আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ঠা করা হয়েছিল। এছাড়া, মহাজনদের সুদের বেড়াজালে পড়ে এদেশের অগণিত মানুষ ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে নিঃস্ব, অসহায়, বাস্তহারা হয়েছিল। ব্যাংক স্থাপনের নামে এ সকল মহাজনদের অনৈতিক কার্যক্রমকে প্রতিষ্ঠানিক ও আইনি সহায়তা দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়। ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে বৃটিশরা গণমানুষের কল্যাণের বিষয়টি অত্যন্ত সচেতনভাবে এড়িয়ে যায়। ফলে, বৃটিশ প্রবর্তিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এদেশের সাধারণ কৃষক, দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষের কোন কল্যাণ সাধিত হয়েছে একথা কেউ বলতে পারবে বলে মনে হয়না।

বৃটিশ শাসনামলের ন্যায় পাকিস্তান আমলে ও বৃটিশ আদলে ব্যাংক স্থাপনের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়।

ভারত বিভিক্তির মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে স্টেট ব্যাংক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৪৯ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান নামে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাকিস্তানে মোট ৩৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্মরত ছিল যার মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শুধু ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, হাবিব ব্যাংক এবং অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংকের একটি করে শাখা ছিল। দি ইউনাইটেড ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক এবং কমার্স ব্যাংক নামে চারটি পাকিস্তানী ব্যাংক ১৯৫৯-১৯৬৫ সময়কালে বাংলাদেশ অঞ্চলে ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনা করে। পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের মালিকানাধীন ঢাকায় প্রধান কার্যালয় সমেত মাত্র ২টি ব্যাংক ছিল। ব্যাংক দুটি হচ্ছে ইষ্টার্ন রিফাইনারী মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ পরবর্তীতে পূবালী ব্যাংক (১৯৫৯) এবং ইষ্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ পরবর্তীতে উত্তরা ব্যাংক (১৯৬৫)।

সুতরাং, দেশ ও জাতির উন্নয়ন, জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী ও গতিশীল করা তথা আপামর জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ব্রত নিয়ে নয়, লুণ্ঠন, নিজেদের আর্থিক স্বার্থ ও শোষণের পথ সুগম ও সহজতর করতেই ঔপনিবেশিক আমলে ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সেই সাথে তাদের তাবেদারি করে এমন কোন ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়কে সব রকম সুবিধা দিয়ে সমাজে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে স্বার্থ উদ্ধারের একটি কৌশল হিসেবে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলণ করা হয়। ফলে, ঔপনিবেশিক আমলে অর্থনীতির কারিগর সাধারণ কৃষক, দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সম্ভবত: এমন নজির একটিও।

গ. বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা :

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা পাকিস্তান হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১১৩০টি শাখা নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু করে। স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার বিদেশী ব্যাংক ব্যতীত বাংলাদেশে কর্মরত সহ পাকিস্তানী মালিকানাধীন ব্যাংক অধিগ্রহণ করে। অতঃপর, ১৯৭২ সালের ব্যাংক জাতীয় করণ আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশী মালিকাধীন ২টি ব্যাংক সহ অধিকৃত ১০টি পাকিস্তানী ব্যাংকের একত্রীকরণের মাধ্যমে ৬টি স্বতন্ত্র ব্যাংক গঠন করে। নতুন নামকরণকৃত ও পুনর্গঠিত ব্যাংকগুলো হচ্ছে দ্য ন্যাশনাল ব্যাংক পাকিস্তান, দ্য ব্যাংক অব জহওয়ালপুর এবং দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংকের সমন্বয়ে সোনালী ব্যাংক, হাবিব ব্যাংক ও কমার্স ব্যাংকের সমন্বয়ে অগ্রণী ব্যাংক, দ্য ইউনাইটেড ব্যাংক ও দ্য ইউনিয়ন ব্যাংকের সমন্বয়ে জনতা ব্যাংক, দ্য মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক ও দ্য স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের সমন্বয়ে রূপালী ব্যাংক, দ্য অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক, দ্য ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সমন্বয়ে পূবালী ব্যাংক এবং ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন উত্তরা ব্যাংক নামে রূপান্তরিত হয়। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার দ্বারা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৮০ এর দশকে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ধারা সূচনা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় উত্তরা ব্যাংক এবং পূবালী ব্যাংকে ১৯৮৩ সালে ব্যক্তি মালিকানায় রূপান্তর করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ (১৯৮৩), ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ (১৯৮৩), দ্য সিটি ব্যাংক লিঃ (১৯৮৩), আরব বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৮৫), আল-বারাকা ব্যাংক লিঃ (১৯৮৩), প্রাইম ব্যাংক (১৯৮৫), ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ (১৯৯৬), ওয়ান ব্যাংক (১৯৯৯), ব্যাংক এশিয়া (১৯৯৯) ইত্যাদি ব্যাংক স্থাপন করা হয়।

চতুর্থ প্রজন্মের ব্যাংক হিসেবে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বেসরকারি খাতে প্রবাসি বাংলাদেশি মালিকানায় ৩টি সহ মোট ৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়। সাউথ বাংলা কমার্স এন্ড এগ্রিকালচ-ারাল ব্যাংক লিঃ, ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ, মধুমতি ব্যংক লিঃ, দ্য ফার্মার্স ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি নামে ব্যাংক

গুলো তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

৫. দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র এবং মূল্যায়ণ

বর্তমানে দেশে চার ধরনের তফশীলি ব্যাংক রয়েছে। সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৫৬টি তফশীলি ব্যাংক রয়েছে যার মধ্যে ৪টি সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৪টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩৯টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। এ সকল ব্যাংক ৮৬৮৫ টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে যার মধ্যে শহরাঞ্চলে ৩৭২৩টি এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৯৬২টি অবস্থিত। শতকরা হারে যা যথাক্রমে ৪২.৮৭ ভাগ এবং ৫৭.১৩ ভাগ। মোট রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখার মধ্যে ১২৬৮টি শহরাঞ্চলে এবং ২২৫২টি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। শতকরা হারে যা ৩৬.০২ ভাগ এবং ৬৩.৯৮ ভাগ স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের শাখার মধ্যে ২২০৮টি শহরাঞ্চলে ও ১৩৯৪ টি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত শতকরা হারে যা ৬১.৩০ ভাগ এবং ৩৮.৭০ ভাগ। বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখার মধ্যে ১৭৮টি শহরাঞ্চলে ১৩১৬টি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। শতকরা হারে যা ১১.৯১ ভাগ এবং ৮৮.০৯ ভাগ এবং বিদেশি ব্যাংকের ৬৬টি শাখার সবগুলোই শহরাঞ্চলে অবস্থিত। গ্রামাঞ্চলে কোন শাখা নেই। নিম্নে অঞ্চলভিত্তিক ব্যাংক শাখার বিস্তার সারণীর মাধ্যমে দেখানো হলো।

সারণি ঃ অঞ্চলভিত্তিক শাখার বিস্তার

ব্যাংকের ধরণ	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			শাখার সংখ্যা (শতাংশে)		
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪	১২৬৮	২২৫২	৩৫২০	৩৬.০২	৬৩.৯৮	১০০
বিশেষায়িত ব্যাংক	৪	১৭৮	১৩১৬	১৪৯৪	১১.৯১	৮৮.০৯	১০০
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩৯	২২০৮	১৩৯৪	৩৬০২	৬১.৩০	৩৮.৭০	১০০
বিদেশি ব্যাংক	৯	৬৯	০	৬৯	১০০	০	১০০
মোট	**৫৬**	**৩৭২৩**	**৪৯৬২**	**৮৬৮৫**	**৪২.৮৭**	**৫৭.১৩**	**১০০**

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক, ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত।

ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল্যায়ণে বলা যায়, এদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সর্বত্রই ঔপনিবেশিকতার ভূত কাঁধে চেপে আছে। ঔপনিবেশিক শাসনের ব্যাংকিং কার্যক্রমের পর্যালোচনা করলে জনকল্যাণে ব্যাংকিং পরিচালিত হয়েছে একথা বলার সুযোগ নেই। একই ভাবে তথ্য প্রযুক্তির এই আধুনিক যুগের এই বাংলাদেশেও জনকল্যাণে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার সংস্কৃতি চালু করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের ব্যাংকিং এর বর্তমান অবস্থা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তনের পথে মারাত্মক বাধা হিসেবে কাজ করছে বলাই বোধ হয় যৌক্তিক হবে। ব্যাংকিং খাতের দুর্বল ব্যবস্থাপনার কথা দীর্ঘদিন ধরে শোনা যায়। দুর্বল ব্যবস্থাপনা, অনিয়ম, দুর্নীতির জন্যই প্রকৃত শিল্প উদ্যোক্তা, কৃষক, ব্যবসায়ী ঋণ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়ে আসছে এবং স্বজনপ্রীতি, আর্থিক অনিয়ম, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, পেশীশক্তির কাছে নত হয়ে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করে যাচ্ছে। ফলে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্যে ঋণের ব্যবহার যথাযথ না হয়ে বরং বিলাস বহুল জীবন যাপন, আরাম আয়েশ, ভোগ বিলাসে ব্যয়িত হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলছে।

সম্প্রতি দুর্বল ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি অসততা, অনৈতিকতা, ব্যক্তিস্বার্থ ব্যাংকিং ব্যবসার সাথে জড়িয়ে গেছে। ব্যাংকিং প্রথার বাইরে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালানা করে জনগণের অর্থ হাতিয়ে নিজেদের পকেট ভারী করছে। জন্ম হচ্ছে হলমার্ক কেলেংকারির মত ভয়াবহ কেলেংকারির। সার্বিক বিবেচনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ব্যাংকিং সেক্টরের ভূমিকা দিনে দিনে গৌণ হয়ে আসছে অথবা যতটুকু ভূমিকা রাখার

সুযোগ আছে তা করছেনা।

সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, এদেশের সাধারণ মানুষের ব্যাংকিং সেবা পাওয়ার কোন অবস্থা নেই বললেই চলে। বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থার পুরো চিত্র পর্যালোচনা করে আমরা এ সত্যটিই খুঁজে পাব। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ অর্থমন্ত্রী এ.এম.এ. মুহিত বলেছেন, দেশে মোট সোয়া এক কোটি ব্যাংক হিসাবদারী রয়েছেন। তিনি সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেকের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক স্মরণ সভায় তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বেতন দেয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের একটি চুরির জায়গা ছিল। শিক্ষকদের নামে বেতন তোলা হতো। কিন্তু, শিক্ষকরা সেই বেতন পেতেন না। কর্তা ব্যক্তিরা সেটা নিয়ে যেতেন। এএসএইচকে সাদেক এটা বন্ধ করেন। এখন বিষয়টাকে খুবই সাধারণ ও সহজ মনে হচ্ছে। কিন্তু তিনি যখন করেছেন, তখন সেটা সহজ ও সাধারণ ছিল না। তিনি বললেন, বেতন নিতে হলে সকল শিক্ষককে একটি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। মানুষের ব্যাপক আকারে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দেয়ার ক্ষেত্রে সাদেকের পথযাত্রা আমরা এগিয়ে নিয়ে গেছি।

যদি প্রশ্ন করা হয় অর্থমন্ত্রীর ভাষায় এই সোয়া এক কোটি লোক কারা ? ব্যবসায়ী শিল্পপতি, সরকারি চাকুরিজীবীর মত কেবল স্বচ্ছল মানুষকেই ব্যাংক হিসাবদারী হিসেবে খুঁজে পাব। এদেশের সাধারণ দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষের ব্যাংকিং সেবা লাভের সুযোগ কোথায় ?

ব্যাংকের মালিক কারা হয় এ নিয়েও প্রশ্ন আছে। আসলে ব্যাংকের মালিক হয় কারা ? অনেকেই রাজনৈতিক পরিচয় বা রাজনৈতিক তদবিরের মাধ্যমে ব্যাংকের মালিক বনে গেছে। প্রকৃত উদ্যোক্তার হাতে ব্যাংকের মালিকানা আছে এদের সংখ্যা নিতান্তই কম বলা চলে। অধিকন্তু, অবৈধ ও অনৈতিক পন্থায় উপার্জনকারী কালো টাকার মালিক এমন অনেককেই এই তালিকায় পাওয়া যাবে। ফলে দেখা যায়, ব্যাংকিং ব্যবসায়কে অযৌক্তিক ভাবে ব্যবহার করে এই মালিকেরা লাভের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে মরিয়া হয়ে ওঠে। গত ২৯ অক্টোবর, ২০১৪ দৈনিক সমকাল পত্রিকার ডাচ- বাংলায় ৩২৬ কোটি টাকার বেনামি শেয়ার শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্যোক্তা আবেদুর রশিদ খানের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে নিজের বড় অঙ্কের শেয়ার অন্যের নামে রাখার তথ্য পাওয়া গেছে। যার নামে শেয়ার কেনেন, তিনিও প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্যোক্তাদের একজন। তার নাম আবদুস সালাম। এদু'জনের মধ্যে লেনদেন নিয়ে বিবাদ হওয়ায় বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালে বেনামে শেয়ার রাখার তথ্য উদ্ঘাটন হয়। শেষ পর্যন্ত উভয়েই আদালতে বেনামে শেয়ার রাখার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এ শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্য ৩২৬ কোটি টাকা। ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বেনামে শেয়ার ধারণ করতে পারেন না। কেউ তা করলে তার সমুদয় শেয়ার বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিধান রয়েছে। এ কারণে আবেদুর রশিদের নামে-বেনামে ব্যাংকের প্রায় ২২ শতাংশ শেয়ার বাজেয়াপ্ত হতে পারে। এর বর্তমান বাজারমূল্য ৪২৯ কোটি টাকা। শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, আবেদুর রশিদের নামে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের ৫ দশমিক ২৩ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১০৩ কোটি টাকা। আবদুস সালামের নামে রয়েছে ব্যাংকের ১৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ শেয়ার। আবদুস সালামের নামে থাকা আরও প্রায় ২ শতাংশ শেয়ার আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ইতিমধ্যে আবেদুর রশিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হরাইজন অ্যাসোসিয়েটসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

জানা গেছে, ১৯৯৩ সালে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সময় নিজের বিনিয়োগ গোপন রাখতে আবেদুর রশিদ ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকটাত্মীয় আবদুস সালামের সহযোগিতা নেন। তার নামেই সিংহভাগ শেয়ার ক্রয় করেন। পরে ওই শেয়ারের বিপরীতে লভ্যাংশের

পুরোটাই আবদুস সালামের মাধ্যমে ভোগ করতেন আবেদুর রশিদ খান। ২০০৭ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটি থেকে বার্ষিক লভ্যাংশ হিসেবে ৪ কোটি ৮১ লাখ টাকারও বেশি মুনাফা আবদুস সালামের মাধ্যমে নিয়েছেন আবেদুর রশিদ। ২০০৭ সালে ওয়ান-ইলেভেন পরবর্তী রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আবদুস সালাম ওই শেয়ারের মালিকানা নিজের বলে দাবি করেন এবং মূল মালিক আবেদুর রশিদকে লভ্যাংশ প্রদান বন্ধ করে দেন। নিজে লভ্যাংশ ভোগ করার পাশাপাশি এ সময়ে তিন দফায় তৎকালীন ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের ১ লাখ ৪৮ হাজার ৮৯৬টি শেয়ার ২০ কোটি টাকায় বিক্রি করেন আবদুস সালাম। জানা গেছে, এ টাকায় গুলশানে ফ্ল্যাট ও নিজের ব্যবহারের জন্য গাড়ি কেনেন। এক সময়ের স্বল্প বেতনভোগী হয়েও বেনামে পাওয়া শেয়ারের কিছু অংশের বদৌলতে আজ তিনি কোটিপতি। এই ঘটনা প্রমাণ করে প্রকৃত ব্যাংক ব্যবসায়িদের ব্যাংকের মালিক হওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। এমনও দেখা যাচ্ছে একটি ব্যাংকের পুরো কতৃত্ব রয়েছে একজন ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবি সম্প্রদায়ের হাতে। ২১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ব্যাংকের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়, সিটি ব্যাংকে দুই পরিবার থেকে নয় জন, ন্যাশনাল ব্যাংকে এক পরিবারের পাঁচ জন ও প্রিমিয়ার ব্যাংকে চার জন পরিচালক রয়েছে। অথচ ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১(সংশোধিত ২০১৩) অনুসারে ব্যাংকে একক পরিবারের পরিচালকের সংখ্যা সর্বোচ্চ দু'জন থাকার কথা। বাংলাদেশ ব্যাংক বারবার তাগাদা দিয়েও চারটি ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদে একক পরিবারের পরিচালকের সংখ্যা দু'জনে নামিয়ে আনতে পারেনি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং, একেবারে সুনির্দিষ্ট করেই বলা যায়, জনস্বার্থে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কোন পটভূমি এদেশে গড়ে ওঠেনি বরং কতিপয় ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায়, পেশাজীবিকে পূনর্বাসন করতে এবং তাদের ব্যাংক ব্যবসায়ের মাধ্যমে লাগামহীন মুনাফা লাভের সুযোগ করে দেয়াই যেন এদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আর তাই পত্রপত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায়, অধিক হারে সার্ভিস চার্জ, সুদের হার নির্ধারণে অনৈতিক ও অযৌক্তিক ভাবে ব্যাংক ব্যবসায়কে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি ব্যাংকিং কার্যক্রমের ওপর মালিকদের নিরঙ্কুশ কর্তৃক স্থাপন করে অনেক বড় বড় আর্থিক কেলেংকারী সম্পাদন করছে। একই পরিবারের একাধিক সদস্য একটি ব্যাংকের ওপর পারিবারিক কর্তৃত্ব স্থাপন করে চলছে যা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। গত ৮ নভেম্বর, ২০১৪ দৈনিক মানব জমিন পত্রিকায় ব্যাংকিং খাতে উদ্বেগ বাড়ছে শিরোনামে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনায় ব্যাংকিং খাতে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে ধাপে ধাপে প্রায় ৬টি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক বসানো হয়েছে। এর মধ্যে বেশি আলোচিত ন্যাশনাল ও মার্কেন্টাইল ব্যাংক। ব্যাংক দু'টিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে পর্যবেক্ষক বসিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সব মিলিয়ে এবার ব্যাংকিং খাতের বাস্তব চিত্র জানতে চায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা র্পষদ। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি পরিচালনা পর্ষদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও বৈঠকটি নিয়মিত বৈঠকের অংশ ছিল। তবুও এ বৈঠকজুড়ে স্থান পেয়েছে ব্যাংকিং খাতের নানা অনিয়ম। পর্যালোচনা করা হয় রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী ও বেসিক ব্যাংকের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে। চাওয়া হয়েছে ব্যাংকগুলোর আর্থিক পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন। এ প্রতিবেদন জমা দেয়ার ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। চলতি সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে প্রতিবেদনটি জমা দেয়ার নির্দেশনা রয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, আর্থিক সূচকের ওপর ভিত্তি করে প্রতি বছর ব্যাংকগুলোর মানদন্ড নির্ণয় (ক্যামেলস রেটিং) করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকগুলোর ওপর একটি মেমো তৈরি করে পরিচালনা পর্ষদে উত্থাপন করা হয়। বৈঠকে ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত জুন প্রান্তিকে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকে মোট খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ১৯ হাজার ৭১৯ কোটি টাকা, যা গত মার্চ প্রান্তিকে ছিল

১৮ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকা। খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়ায় পাশাপাশি ব্যাংক চারটির মন্দ ঋণও বেড়েছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। গত মার্চ প্রান্তিকে চার ব্যাংকের মন্দ ঋণ ছিল ১৫ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা, যা জুন শেষে বেড়ে হয়েছে ১৬ হাজার ৬৪৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট খেলাপি ঋণের ৮৫ শতাংশই মন্দ ঋণ। এ মন্দ ঋণের কারণে কাঙ্খিত হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারছে না। শুধু সোনালী ও রূপালী ব্যাংকেরই প্রভিশন ঘাটতি হয়েছে এক হাজার ৩৫৬ কোটি টাকা। মন্দ ঋণ বেড়ে যাওয়ায় সোনালী ও রূপালী ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে সোনালী ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি দেখা দিয়েছে এক হাজার ৫১১ কোটি টাকা ও রূপালী ব্যাংকের ২১৭ কোটি টাকা।

সহজ কথায় এদেশের ব্যাংকিং কাঠামো এমনভাবে দাঁড় করানো যে, তা জনগণের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে যা কতিপয় ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায়ের ফুলে ফেঁপে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ফলে বৈষম্য, ভেদাভেদ, হিংসা, বিদ্বেষ, বেড়েই চলছে। এদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় জনস্বার্থ উপেক্ষিত হলেও ব্যাংকগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাগজে কলমে কোন ঘাটতি আছে বলে মনে হয়না। গত ৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড গ্রাম ও শহরের বৈষম্য কমিয়ে বিনিয়োগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করতে কাজ করছে বলে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে যা পরের দিন একটি পত্রিকা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। চতুর্থ প্রজন্মের একটি ব্যাংকের অফি-সয়াল ওয়েবসাইটে ব্যাংকের Mission এর প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, Emancipate our poor people from abject poverty by empowering them with smooth Banking service.

আসলেই কি তাই ? একথা সত্য যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রম সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। আর এলক্ষ্যে নতুন নতুন অনেক ক্ষেত্র তৈরী করে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। প্রকৃত বিবেচনায় ব্যাংকগুলো সেরকম কোন কাজ করে যাচ্ছে কী ? সত্যিকার গ্রামীণ জীবন মান উন্নয়নে ব্যাংক গুলো কতটুকু কাজ করছে ? সামগ্রিক বিবেচনায় দেশের ৯০ শতাংশ ঋণই ঘুরপাক খাচ্ছে শহরের মধ্যে। আমানত সংগ্রহে ৮২ শতাংশ আসছে শহরাঞ্চলের শাখাগুলো হতে। বাকী ১৮ শতাংশ আসে গ্রাম থেকে। ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের একটি বিরাট অংশ বিনিয়োগ করা হয় ঢাকা ও চট্টগ্রামের দু'টি এলাকা হতে। এ থেকেই বোঝা যায়, গ্রাম উন্নয়নে ব্যাংক গুলোর কতটুকু ভূমিকা রাখে।

দেশের উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন সত্যিই কি ব্যাংকগুলো উৎসর্গীকৃত ? এক কথায় উত্তর না। বাস্তবে ব্যাংকের শাখা স্থাপনে শহরে ও গ্রামে ১:১ যে অনুপাত আছে তা যথাযথ অর্থে মানা হচ্ছে না। কতিপয় ডেইরী ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্মে অর্থায়ন করে কিংবা ব্যবসায়ীদেরকে অর্থ ঋণ দিয়ে, কাগজে কলমে কৃষি ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে দেখানো হচ্ছে কৃষি উন্নয়নে এক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে কতগুলো বিশেষায়িত ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। যেমন- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি। এদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলেও আমরা মোটামুটি গতানুগতিক চিত্রই পাবো। কেবল গ্রামীণ ব্যাংকের কতগুলো বিষয় বিবেচনা করলেই এই বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর মূল্যায়ন চিত্র পাওয়া যাবে। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টি, ক্ষমতায়ন, উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে নারীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং গ্রামীণ দরিদ্র, ভূমিহীন দরিদ্র মহিলাদের অর্থায়ন করে থাকে। দরিদ্র মহিলা নির্বাচনে যে মানদন্ড নির্বাচন করা হয়েছে অর্থায়নে তা যথাযথ মানা হয় কিনা ? নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে করতে ব্যর্থ হলে গ্রামীণ ব্যাংকের অনেক সদস্যা তাদের সদস্য পদ হারায়। প্রশ্ন হলো, দারিদ্র্য বিমোচন যদিই মূখ্য বিষয় হয়, আর দারিদ্র্যের জন্যই নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে

সক্ষম না হলে কোন সদস্যের সদস্য পদ বাতিল করার কাজটি কতটুকু যৌক্তিক ? বস্তুত, দরিদ্র মহিলাদের নয় কত দ্রুত ও নিশ্চিত ভাবে রিটার্ন আসবে এই দিক বিবেচনা করেই গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে।

মোবাইল ব্যাংকিং ধারনাটি বাস্তব সম্মত উপায়ে ব্যবহার করে ব্যাংকিং ব্যবসায়কে গণমানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার সহজতম কাজটি করা হচ্ছেনা। বিভিন্ন কারণে মোবাইল ব্যাংকিং দেশে জনপ্রিয় উঠছে। এখন প্রতি মাসে শত কোটি টাকার লেনদেন মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে আসছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মোট ২৮ টি ব্যাংককে মোবাইল ব্যাংকিং করার জন্য অনুমোদন দিয়েছে যার মধ্যে ১৯ টি ব্যাংক এ সেবা চালু করেছে। প্রতি দিন গড়ে ২৫০ কোটি টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে লেনদেন হচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির সাথে সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে গণমানুষের ব্যবহার সুযোগ রয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং বর্তমান চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় লেনদেন প্রতি যে ফি আদায় করা হয় তাতে গণমানুষের কল্যাণের বিষয়টি সমর্থন করেনা।

আর সবচেয়ে বড় বিষয় দুর্নীতি, অনিয়ম, অবস্থাপনায় ব্যাংকিং খাত আজ ডুবতে বসেছে। গত ১৬ জুন, ২০১৪ তারিখে প্রথম আলো পত্রিকায় দুর্নীতি সর্বত্র, ব্যাংক খাত ভেঙ্গে পড়েছে শিরোনামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। তাতে উল্লেখ করা হয়, চলতি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে গত ৯ জুন, ২০১৪ বিরোধী দলের সাংসদ কাজী ফিরোজ রশীদ জাতীয় সংসদে বলেন, ব্যাংকিং খাতের দক্ষতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী তার বাজেটে। কিন্তু, ব্যাংক খাতে নৈরাজ্য চলছে। দুর্নীতি সর্বত্র ছেয়ে গেছে। ব্যাংক খাত আজ তছনছ হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, যাদের দায়িত্ব ব্যাংক খাত তদারক করা, তারা আজ দুর্নীতিতে ডুবে আছে। এক শ্রেণির কর্মকর্তারা দুর্নীতিতে যুক্ত হয়ে পড়ার কারণে কারোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছেনা। সোনালী ব্যাংকে লুটপাট হয়েছে। জনতা ব্যাংক লুটপাট হয়েছে। বেসিক ব্যাংককে ধ্বংস করা হয়েছে। ভারতের সোমনাথ মন্দিরের পর এত বড় দুর্নীতি আর কোথাও হয়নি। সোনালী, জনতা, বেসিকে এত লুটপাট হওয়ার পরও দেখার কেউ নেই।

সুতরাং, আজকের বাস্তবতায় দেশের পুরো ব্যাংক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। ব্যাংকিং আইনকে সংস্কার করে যুগোপযুগি ও বাস্তব সম্পন্ন করে পুরো ব্যাংকিং কাঠামোতে নতুন রূপ দান করতে হবে যাতে দারিদ্র বিমোচন করে দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধন করা যায়। জাতীয় অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হলো ব্যাংকিং খাত। আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ (Financial Inclusion) কর্মসূচির আওতায় গত কয়েক বছরে দেশের অনেক সাধারণ মানুষ ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ পেয়েছে। তাদের মধ্যে গ্রামের সাধারণ দরিদ্র, কৃষক, বিত্তহীন ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করতে হচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম ও মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মধ্য দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে, দরিদ্র মানুষকে এর আওতায় আনার ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। সম্প্রতি 'বৈশ্বিক মাইক্রোস্কোপ ২০১৪ : আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ পরিবেশ সক্ষমতা' প্রতিবেদন প্রকাশ করে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)। এতে বিশ্বের ৫৫ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২৯তম এবং প্রাপ্ত স্কোর ১০০-এর মধ্যে ৪৫। ইআইইউর মূল্যায়ন অনুযায়ী আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সক্ষমতায় বাংলাদেশ মাঝের সারিতে রয়েছে। কিন্তু, তার পরেও দেশের মোট জনসংখ্যার বিরাট অংশ ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরে রয়ে গেছে। সরকারি ব্যাংকগুলো দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় সাধারণ মানুষকে ব্যাংকিং সেবা দিতে সচেষ্ট থাকলেও সবার জন্য উন্নত ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করা যায়নি। অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনতে তথা টেকসই উন্নয়নে ব্যাংকিং খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা, কঠোর নজরদারি, শক্তিশালী আইন, প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার সবই দরিদ্র সাধারণ মানুষের কল্যাণে তথা

জনস্বার্থে পরিচালনা হওয়া জরুরী। দরিদ্র মানুষের কল্যাণে প্রয়োজন দরিদ্র মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। অপ্রত্যাশিত হলেও সত্য যে, দরিদ্র মানুষ সম্পর্কে আমাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারছিনা বা করার চেষ্ঠা করছিনা। একজন দরিদ্র মানুষের প্রতি যে দরদ, মমতা, প্রতিশ্রুতি থাকা বাঞ্চনীয় অনাকাঙ্খিত হলেও আমাদের তা নেই।

৬. গণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্বরূপ ঃ

কর্মসংস্থান, নগদ সহায়তা, সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টি, মালিকানা প্রদান করে দারিদ্র বিমোচনে মূলত: বাংলাদেশ ব্যাংককেই পথ প্রদর্শকের ভূমিকা রাখতে হবে। প্রয়োজনে গণমূখী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধনে দেশ ও জনগণের স্বার্থে প্রয়োজনে ব্যাংক গুলোকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

সরকারি হিসেবে দেশের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৫৮ লক্ষ এবং দারিদ্র্যের হার ৩১.৫ শতাংশ। সে হিসেবে দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা ৪ কোটি ৯০ লক্ষ ৭৭ হাজার (প্রায় ৫ কোটি)। গণমুখী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হবে এই ৫ কোটি দরিদ্র মানুষকে ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের এনে এসকল পরিবারের জন্য শতভাগ আর্থিক নিরাপত্তা বলয় তৈরী করা। কাজটি নিখুঁত ও পরিচ্ছন্নভাবে সম্পাদন করতে একটি দারিদ্র্য শুমারি সম্পন্ন করা যেতে পারে। একটি ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার তৈরী করে দরিদ্র মানুষ নির্বাচন কাজটি সহজতর, শতভাগ স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত করা যায়। দরিদ্র মানুষ হিসেবে ভূমিহীন, বাস্তুহারা, দরিদ্র, প্রান্তিক কৃষক, প্রতিবন্ধি, বিধবা, অনাথ, বৃদ্ধ, শ্রমজীবী মানুষসহ সকল অসহায় মানুষকে বিবেচনা করতে হবে। সকল দরিদ্র মানুষকে ব্যাংকিং নেটওয়াওর্কের আওতায় নিয়ে আসার কাজটি সহজ নয়। একই সাথে এক বা দুই বছরে সকল দরিদ্র্য মানুষের জন্য এই সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ সত্যটি উপলব্ধি করে প্রথমেই একটি বাস্তব সম্মত, কার্যকর কর্মপরিকল্পনা সম্পাদন করতে হবে।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, শোষিত বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়ন ব্যতিত দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভভ নয়। এ সত্য মেনে নিয়ে ব্যাংকিং সেবাকে আরো প্রসার, যৌক্তিক, আধুনিক ও সুসংহত করা জরুরী। বিদ্যমান ব্যাংকিং কাঠামোতে আমূল সংস্কার সাধন করে ব্যাংকিং সেবাকে মানুষের দোর-গোড়ায় পৌঁছাতে হবে। বাণিজ্যিক কার্যক্রমের পাশাপাশি মানুষের কল্যাণ সাধনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকিং সেবাকে গণ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। সকল মানুষকে ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যাংক গুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। গ্রামাঞ্চলের নাম ধরে প্রকৃত অর্থে শহরাঞ্চলে শাখা স্থাপনের পথ সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করতে হবে। দেশের অগণিত বঞ্চিত, দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে শুধু অর্থায়ন করে নয়, কর্মসংস্থান, নগদ সহায়তা, শিক্ষা সহায়তা, মালিকানায় অংশীদারিত্ব ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

একটি ব্যাংক বছরে যে পরিমাণ অর্থায়ন করে তার ন্যূনতম ৪০ শতাংশ দরিদ্র মানুষকে অর্থায়ন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে। গণমানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে গ্রামাঞ্চলে অর্থায়নের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। ব্যাংকিং কার্যক্রম গণমুখী করতে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল ধারনা দুটি নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এতে শহরাঞ্চল বলতে জেলা ও উপজেলা শহর গুলোকে এবং গ্রামাঞ্চল বলতে জেলা, উপজেলা শহরের নির্ধারিত সীমানার বাইরের এলাকাকে বিবেচনা করা যেতে পারে। ব্যাংকিং সেবা প্রসারে এই সীমানার বাইরে গ্রাম্য বাজার বা গ্রামের শাখা স্থাপন করলেই কেবল গ্রামাঞ্চলে শাখা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে যাতে গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপনের নামে প্রকৃত অর্থে শহরাঞ্চলে শাখা স্থাপনের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়। দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য প্রদান করতে ৪০ শতাংশ ঋণকে বিশেষ ঋণ সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জামানত, ঋণ পরিশোধের সময়, কিস্তি প্রদান, ঋণের

আকার, সুদের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ লক্ষ্যে জামানত- বিহীন ব্যাংক রেট বা তার সামান্য কিছু বেশি সুদের হারে, তিন বছর সময়ে পরিশোধ যোগ্য, জনপ্রতি নূন্যতম ৫০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ প্রদানের কথা ভাবা যেতে পারে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাংকগুলো এদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এ লক্ষ্য পূরণে নিরাপত্তা কর্মী, পিয়ন ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলে- মেয়েকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। বর্তমানে অনেক দরিদ্র ঘরের ছেলে মেয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বেকারত্বের অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে। ব্যাংকের কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাংকগুলো কর্তৃক পরিচালিত Corporate Social Responsibility (CSR) কার্যক্রম ঢেলে সাজানো যায়। বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলো বছরে ৬০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকা CSR বাবদ ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন কার্যক্রমে এ সকল ব্যয় করে থাকে। গণমুখী ব্যাংকিং ধারনা প্রতিষ্ঠিত করতে CSR খাতের ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে অনিয়ম হয় তা দূর করে দেশের দরিদ্র অসহায় মানুষকে নগদ সহায়তা হিসেবে প্রদান করার কথা ভাবতে হবে।

প্রতি শাখার জন্য ১০ জন দরিদ্র মানুষকে বিশেষ সম্মানী সদস্য হিসেবে সদস্য নির্বাচিত করার বিধান চালু করতে হবে এবং প্রতিটি সদস্য প্রতি মাসে সম্মানী হিসেবে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা প্রদান করা যেতে পারে। বিশেষ সম্মানী সদস্যদের বছরে যে পরিমাণ সম্মানী দেয়া যায় তা হবে দু'জন কর্মকর্তার বেতনের সম পরিমাণ অর্থ প্রদান করেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দরিদ্র মানুষকে ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের আওতায় আনা যায়। প্রতিটি শাখায় বিভিন্ন পদে জনবলের অভাব থাকতে দেখা যায়। শূন্য পদের দৈনিন্দিন কাজ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারিদের মাধ্যমে করানো হয়। প্রতিদিনের কাজ সম্পাদন করা হলেও এসকল শূন্য পদের বেতন প্রদান করতে হয়না। ফলে, বিপুল পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত থেকে যায়। বিকল্প হিসেবে এই সঞ্চিত অর্থও সম্মানি হিসেবে প্রদান করার কথা ভাবা যেতে পারে।

দরিদ্র ঘরের অনেক মেধাবী ছেলে মেয়ে অর্থের অভাবে পড়াশুনা করতে পারেনা অথবা মান সম্পন্ন শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শৈশবেই উপার্জনে বাধ্য হওয়া, পিতা-মাতার অসচেতনতা, অনিশ্চয়তা, সামাজিক বঞ্চনা প্রভৃতি কারণে দরিদ্র ঘরের অসংখ্য মেধাবী ছেলে মেয়ে শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঝরে পড়া এসকল ছেলে মেয়েদের চিহ্নিত করে তাদের শিক্ষার লাভের অধিকার সুগম করতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই বৃত্তি প্রদান এবং সহজ শর্তে শিক্ষা ঋণ চালু করার বাধ্যবাধকতা চালু করতে হবে।

মোবাইল ব্যাংকিং সেবাকে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে। দরিদ্র মানুষের কল্যাণে মোবাইল ব্যাংকিংকে আরও যৌক্তিক করা যেতে পারে। এলক্ষ্যে প্রাথমিক অবস্থায় পাঁচ কোটি দরিদ্র মানুষের জন্য মোবাইল ব্যাংকিং আওতায় আনতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হিসাব খোলত হবে যে হিসাবগুলোতে ন্যূনতম রেটে টাকা স্থানান্তরের সুযোগ দিয়ে তাদের আয়ের একটি সুযোগ দেয়া যেতে পারে। ন্যূনতম রেটে অর্থ স্থানান্তরের সুযোগ প্রদানে ব্যাংক ও মোবাইল অপারেটর গুলো একযোগে এগিয়ে আসতে পারে।

বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোকে কেবল দরিদ্র্য মানুষের কল্যাণে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে হবে। এলক্ষ্যে কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে ব্যাংকিং কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে প্রকৃত দরিদ্রদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষায়িত ব্যাংক গুলোকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা

এবং অদরিদ্রদের অর্থায়নের সুযোগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিষ্ঠিত এসকল ব্যাংকের ব্যাংকিং কার্যক্রমের ১০০ শতাংশ ব্যাংকিং দরিদ্র মানুষের জন্য এবং মোট শাখার ৯৫ শতাংশ গ্রামে এবং ৫ শতাংশ শহরে স্থাপন করতে হবে।

ব্যাংকিং খাত দরিদ্র মানুষের জন্য আলাদা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে ৩০ থেকে ৪০ হাজার মানুষকে দারিদ্র্যের বলয় থেকে বের করে আনতে পারে। পথ প্রদর্শক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কেবল দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান হিসেবে ৫ হাজার মানুষকে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রতি শাখার জন্য ন্যূনতম ৩ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে প্রায় ৩০ হাজার দরিদ্র মানুষের কর্ম সংস্থানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের পথকে আরো সুসংহত ও অর্থবহ করতে পারে।

সঞ্চয় প্রবণতা দরিদ্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিতে হবে। সঞ্চিত অর্থের ওপর প্রচলিত হারের চেয়ে অধিক সুদ প্রদান করে দরিদ্র মানুষকে সঞ্চয় করার উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে। যে কোন সরকারি সুযোগ লাভ করতে ব্যাংকে হিসাব খোলা এবং একই সাথে সঞ্চয় করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪০ শতাংশ ব্যাংকিং দরিদ্র মানুষের জন্য নিশ্চিত করে ন্যূনতম ১০ থেকে ১৫ লাখ মানুষকে অর্থায়ন করা সম্ভব। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৩ লাখ ৪০ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জন্য প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩ লাখ ৮৭ হাজার ৫১৪ কোটি টাকা। ৪০ শতাংশ হিসেবে ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা অর্থায়নে জনপ্রতি ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা দরিদ্র মানুষের জন্য নিশ্চিত করে ১০ থেকে ১৫ লাখ মানুষকে অর্থায়ন করা যায় অনায়াসেই ।

ব্যাংকের CSR বাবদ যে খরচ করে দরিদ্র মানুষকে সরাসরি আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে বছরে ১ লাখ মানুষকে পূনর্বাসিত করতে পারে। গত সাড়ে ছয় বছরে এই খাকে ব্যাংকগুলো ১৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের Review of CSR Iniatives of Banks 2011 প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১১ সালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো CSR বাবদ ২১৮ কোটি ৮৩ লাখ টাকা ব্যয় করেছে। বর্তমানে ৫০০ কোটি টাকার উপরে ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে। এই টাকা দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয় করতে প্রতিজনকে মাসে ৫০০০ টাকা সরাসরি প্রদান করে ১ লাখ মানুষকে সহায়তা করা যায়। আর যদি ব্যাংকে নীট লভ্যাংশের ৩০ শতাংশ এই খাতে ব্যয় করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় তাহলে তা ৩ থেকে ৪ লাখ মানুষকে পূনর্বাসিত করা যায়।

গ্রামাঞ্চলের শাখা স্থাপন দরিদ্র মানুষের জায়গায় নিজ অর্থায়নে ঘর করে ব্যাংকগুলো তাদের গ্রামীণ শাখা স্থাপনে আগ্রহী হতে হবে। এতে ভূমি মালিককে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদান করতে হবে।

প্রতিটি ব্যাংকের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিঙ মিডিয়ায় ভার্চুয়াল বিজ্ঞাপন নিরুৎসাহিত করতে হবে। দরিদ্র মানুষের স্বার্থে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের মডেল করে বিজ্ঞাপন প্রচারে বাধ্য করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংকে নূন্যতম পাঁচটি বিজ্ঞাপন এবং প্রতিটি বিজ্ঞাপনে তিনজন মডেল নির্ধারণ করে তাদের প্রচলিত হারে সম্মানি প্রদান করে।

এভাবে দরিদ্র মানুষের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় সৃষ্টি, শিক্ষা সহায়তা সহ বিভিন্ন উপায়ে ৫ থেকে ১০ লাখ দরিদ্র মানুষকে ব্যাংকিং সেবায় সম্পৃক্ত করার একটি স্বল্প মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

সুতরাং, ব্যাংকিং কার্যক্রমকে গণমুখী করতে একটি বাস্তব সম্মত কর্ম পরিকল্পনা দাঁড় করাতে হবে যাতে করে ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে সকল দরিদ্র মানুষকে ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের আওতায় আনা এবং ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে দেশকে শতভাগ দারিদ্র্য মুক্ত করতে ব্যাংকিং খাত মূখ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দরিদ্র ঘরের শিক্ষিত ও যোগ্য বেকার যুবক, অর্থায়নের ক্ষেত্রে কর্মক্ষম দরিদ্র কৃষক, অর্ধ শিক্ষিত যুবক, বর্গাচাষী, প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নগদ সহায়তার ক্ষেত্রে বৃদ্ধ, অসহায়, প্রতিবন্ধি, অনাথ শিশু ও নারীদের প্রধান্য দিতে হবে।

৭. সুপারিশমালা

দেশের প্রতিটি মানুষকে ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় আনতে গণমুখী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর তার মধ্যে প্রথম অগ্রাধিকার হবে দ্রুততম সময়ে দেশের ৫ কোটি দরিদ্র মানুষকে ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা। আর তা করতে কতগুলো ব্যাংক স্থাপন করা দরকার, কতগুলো শাখা স্থাপন করতে হবে, কতগুলো শাখা শহরে, কতগুলো গ্রামে স্থাপন করতে হবে, শাখা স্থাপনে কোন কোন এলাকাকে প্রধান্য দিতে হবে ? - সে বিষয়ে একটি সুন্দর, সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এটি সত্য যে, দেশের উন্নয়ন সাধন করতে সংকচিত ব্যাংকিং নয়, প্রয়োজন সম্প্রসারণশীল ব্যাংকিং ব্যবস্থা। একটি সত্যিকার গণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে কতিপয় সুপারিশমূলক প্রস্তাব নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

i. প্রতিটি ব্যাংকের ব্যাংকিং কার্যক্রমের নূন্যতম ৪০ শতাংশ এবং লভ্যাংশের নূন্যতম ৩০ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যে-ন্নয়নে ব্যয় করতে হবে।

ii. Corporate Social Responsibility বা CSR কার্যক্রমকে শতভাগ দরিদ্র মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। এই কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট করতে সরাসরি নগদ সহায়তা করে দরিদ্র মানুষের জীবন-মান উন্নয়নে অবদান রাখতে হবে।

iii. প্রতি বছর ব্যাংকগুলো তাদের লভ্যাংশের একটি নির্ধারিত অংশ প্রদান করে পাঁচ বা দশ বছরের একটি বড় ফান্ড গঠন করতে পারে, যে ফান্ড দরিদ্র মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা যেতে পারে।

iv. ১ ঃ ৩ হারে শহর গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপনে দেশী, বিদেশী সকল ব্যাংকে বাধ্য করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংকে এক বছরের মধ্যে এই অনুপাতে গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।

v. দারিদ্র্য বিমোচনের সকল কার্যক্রম তথা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, উন্নয়ন প্রকল্পের শ্রমিকের মুজুরী প্রদান, শিক্ষা লাভ, দক্ষ জনশক্তি গঠন, বিদেশ গমন প্রভৃতিতে সহায়তা করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। দরিদ্র মানুষের ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত ও নিরাপদ করতে শিক্ষা বৃত্তি, স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ও যৌক্তিক পরিমাণ শিক্ষা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

vi. প্রতিটি দরিদ্র মানুষের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে উন্নয়ন ব্যাংকে নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে। অথবা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কাঠামোকে এমনভাবে দাঁড় করাতে হবে যাতে দেশের প্রতিটি দরিদ্র মানুষ এ ব্যাংকের সদস্য হয় এবং ব্যাংকের সহায়তায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সুযোগ লাভ করে। এই ব্যাংক সকল দরিদ্র মানুষকে সম্পৃক্ত করে একাধারে বিশেষায়িত ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, মোবাইল ব্যাংক, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়নসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যা নির্ধারণ ও সমাধানে কাজ করে যাবে। দরিদ্র মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা বলয় হিসেবে এই ব্যাংক অভিভাবক হিসেবে কাজ করবে। একই সাথে গ্রীণ ব্যাংকিং, স্কুল ব্যাংকিং ইত্যাদি কার্যক্রমকে আরো কার্যকর করে দরিদ্র মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে।

vii. দারিদ্র- বিমোচেনের স্বার্থে ব্যাংকিং আইনে ক্রটি থাকলে তা দূর করে বিদ্যমান আইনকে সংস্কার করে বাস্তব সম্মত, যৌক্তিক ও গণমুখী করা যেতে পারে।

viii. ভূমিহীন, বাস্তুহারা দরিদ্র মানুষের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যাংকগুলো এগিয়ে আসতে পারে। ভূমি অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার- অথচ, এদেশের অগণিত মানুষ ভূমিহীন, বাস্তুহারা। এসকল মানুষের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করেই তবে দারিদ্র্য বিমোচনের কথা ভাবতে হবে। তাদের সে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে নগদ সহায়তা, মামলা খরচ, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ব্যাংকগুলো এগিয়ে আসতে পারে।

ix. গণমুখী ব্যাংকিং কার্যক্রম তদারকি করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আলাদা সেল থাকতে হবে। এই সেল অত্যন্ত দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে তাদের তদারকি করবে যাতে কোন অবস্থাতেই একটি ব্যাংক তাদের কাজে ন্যূনতম ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ না পায়।

x. ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করে অনেক ব্যাংক জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরস্কার লাভ করছে। বিভিন্ন মানদন্ড বিবেচনায় এ সকল পুরস্কার লাভ করে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও এ সকল ব্যাংক বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করে। এই সংস্কৃতির পরিবর্তন জরুরী। পুরস্কার লাভে প্রথম মানদন্ড হবে জনসম্পৃক্ততা। সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে অন্য যে কোন পর্যায়ে দক্ষতা দেখিয়ে পুরস্কার লাভ করা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

xi. ১০ থেকে ২০ জন উদ্যোক্তা পরিচালকের হাতে একটি ব্যাংকের মালিকানা প্রদানের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। একই সাথে একই পরিবারের একাধিক সদস্য উদ্যোক্তা পরিচালক হওয়া, একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একাধিক ব্যাংকের মালিক হওয়ার সুযোগও বন্ধ করতে হবে।

xii. প্রতিটি ব্যাংকের প্রতিটি শাখাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যাংকিং পরিচালনার বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে।

xiii. গণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ব্যাংকিং কার্যক্রমকে গণমুখী করতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, কোন কোন ব্যাংক এ কার্যক্রমে এগিয়ে আসছে বা পিছিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি বিষয় গুলো জনসমক্ষে তুলে ধরতে মিডিয়া অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

এভাবে বিভিন্ন উপায়ে দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ব্যাংকগুলো কাজ করতে পারে। ব্যাংকগুলোকে গতানুগতিক কার্যক্রম হতে বের হয়ে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে, ঈঝজ এর মাধ্যমে, বিশেষ সম্মানী সদস্য নির্ধারণের মাধ্যমে, বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ, ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্যের অভিশাপ হতে মুক্ত করতে পারে। আর বিশেষ ঋণ, শিক্ষা ঋণ প্রভৃতি সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচনের পথকে সহজতর করতে পারে। ব্যাংকিং কার্যক্রমকে গণমুখী, কল্যাণমুখী করে স্বল্প সময়ে দেশের দারিদ্র-বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৮. শেষ কথা ঃ

ব্যাংকগুলোকে গণমুখী করতে আমাদেরকে প্রথমেই যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে, পরিবর্তন করতে হবে মন-মানসিকতার। সনাতনী ও পশ্চাদগামী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন তথা ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ব্যাংকিং খাতের অনেক উন্নয়ন হয়েছে বলা হচ্ছে, এখনো হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ব্যাংকিং খাত কি করেছে ? উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় এখাতের আরো অনেক উন্নয়ন হবে। বাস্তব সত্য হলো, ব্যাংকিং সেবা সাধারণ জনগণের জন্য নিশ্চিত না করে এই খাতের উন্নয়ন পরিপূর্ণতা পেতে পারেনা। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন বা টেকসই উন্নয়ন যাই বলিনা কেন গণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন একটি মৌলিক বিষয়।

উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই সত্যটিই খুঁজে পাব। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের কথা বলা হলেও গণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়টি কোথাও উচ্চারিত হচ্ছে বলে মনে হয়না- অথচ, বাস্তব সত্য হলো গণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করেই তবে টেকসই উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। এলক্ষ্যে রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, অর্থনীতিবিদ, জনপ্রশাসন, মিডিয়া, ব্যাংক মালিক, ব্যাংকারসহ সকল সচেতন মানুষকে এ বিষয়ে সোচ্চার হতে হবে।

References :

1. Akter Nargis and Ali Muhammad Mahboob : " E-Bussiness with Special Reference to On-line Banking of Bangladesh : An Analysis", Bangladesh Journal of Political Economy, Volume.26, Number. 2, Bangladesh Economic Association, Dhaka, December, 2010.

2. Bangladesh Bank : Annual Report, July 2012 – June 2013.

3. Khanam, Dilruba and Nghiem, Hong Son : " Efficiency of Banks in Bangladesh – A Non Parametric Approach", Bangladesh Journal of Political Economy, Volume 24, Number 1 &. 2, Bangladesh Economic Association, Dhaka, December,2008.

4. Internet.

5. Review of CSR Iniatives of Banks 2011 : Bangladesh Bank, July, 2012.

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৩, ২০১৪।

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : সমৃদ্ধির নতুন অধ্যায়ে বাংলাদেশ, উন্নয়নে ধারাবাহিকতা, বাজেট বক্তৃতা, ২০১৪-১৫, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ৫ জুন, ২০১৪।

৭. বাংলা পিডিয়া (খন্ড ৭) : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ, ২০০৩।

৮. বাংলা পিডিয়া (খন্ড ৯) : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ, ২০০৩।

৯. সমকাল, ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ, প্রথম আলো সহ বিভিন্ন দৈনিকের বিভিন্ন প্রতিবেদন, কলাম, ফিচার।

১০. হোসেন মোহাম্মদ আমজাদ এবং সেলিম, ড. রুহুল আমিন : " ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন", সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬।